Volume: 3 Issue: 11 Pages: 20-24

আত্মহত্যা কি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য? একটি সমকালীন অধ্যয়ন

[*1] Jayanta Bayen

[*1] State Aided College Teacher-1(SACT-1), Department of Philosophy, Rampurhat College, Birbhum, West Bengal, India.

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 16/Oct/2024
Accepted: 13/Nov/2024

***Corresponding Author**
Jayanta Bayen
State Aided College Teacher-1(SACT-1), Department of Philosophy, Rampurhat College, Birbhum, West Bengal, India.

Abstract
ফলিত নীতিবিদ্যার আঙিনায় একটি বহুচর্চিত বিষয় হলো 'আত্মহত্যা'। আত্মহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Suicide'. ল্যাটিন শব্দ 'Suicidium' থেকে ইংরেজি Suicide শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজের প্রাণনাশের একটি পদ্ধতি। বিশেষ কোনো স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যখন কোন না কোন ভাবে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে তখন তাকে সাধারণভাবে আত্মহত্যা বলা হয়। একজন ব্যক্তি যখন বিশ্বসংসারের দুঃখ-কষ্ট,জ্বালা- যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ, সামাজিক অবমাননা ও গঞ্জনার শিকার হয়, যখন সে অনুভব করে যে, জীবন তার কাছে মূল্যহীন এবং সে তার ইচ্ছানুসারে জীবন কাটাতে অক্ষম, তখন সে অসহায় হয়ে জীবনের সব কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয় এবং জীবনকে সে নিজের ইচ্ছায় ধ্বংস করে দিতে কৃতসংকল্প হয়। এই আত্মহত্যাকে অনেকে যেমন অনৈতিক ও অপরাধ বলেছেন তেমনি আবার কেউ এটিকে সমর্থনও জানিয়েছেন। আলোচ্য নিবন্ধে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যা যে সমর্থনযোগ্য নয়, সেই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

Keywords: আত্মহত্যা, ব্যক্ত, জীবন, নৈতিকতা, মৃত্যু, সমাজ, হতাশা।

Introduction

ভূমিকা: প্রকৃতি সৃষ্ট সেরা জীব হলো মানুষ। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠে এবং পরিশেষে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জীবন চক্রের আরম্ভ হচ্ছে জন্ম ও জীবন চক্রের পরিসমাপ্তি হচ্ছে মৃত্যু। এই মৃত্যু নামক ঘটনাটি নানাভাবে সম্পাদিত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যেমন মানুষের মৃত্যু ঘটে তেমনি আবার প্রকৃতির নিয়মের প্রতিকূলে গিয়েও মানুষের মৃত্যু ঘটে, আত্মহত্যা যার মধ্যে অন্যতম। সাধারণভাবে আত্মহত্যা বলতে বোঝায় নিজের দ্বারা নিজের জীবনকে সমাপ্ত করা। আমরা দেখি যে, এই সুন্দর ভুবনে সকল মানুষ সুখে, শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু যখন মানুষ জীবনে ব্যর্থ হয় তখন তার মধ্যে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, ধৈর্য, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা লোক পায়, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটে এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ আত্মহনন বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

মূল আলোচনা: ফলিত নীতিবিদ্যার অঙ্গনে একটি বহুল বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে 'আত্মহত্যা' ('Suicide')। "আত্ম" অর্থাৎ নিজেকে হত্যার পন্থাই হচ্ছে আত্মহত্যা। আত্মহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Suicide'. ল্যাটিন শব্দ 'Suicidium' থেকে ইংরেজি 'Suicide' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে স্বীয় জীবন বিনাশের একটি প্রণালী বা পদ্ধতি। আত্মহত্যাকে স্ব-অভিপ্রেত ও স্ব-আরোপিত মৃত্যু বলা যেতে পারে। আত্মহত্যার ফলে যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে সেই ব্যক্তি নিজেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে হত্যাকারী এবং হত ব্যক্তি দুজনেই অভিন্ন। আত্মহত্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিমত হলো-

Prof.R.B.Brandt তাঁর 'Moral Problems' গ্রন্থে আত্মহত্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার জীবনকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমাপ্ত করে তবে সেই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলা যাবে।

সমাজ তত্ত্ববিদ Emile Durkheim-এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'আত্মহত্যা' শব্দটির মাধ্যমে সেই সব মৃত্যুর ঘটনাকে বোঝায় যা হত্যাকারী ব্যক্তির ইতিধর্মী অথবা নেতিধর্মী কর্মের ফলে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মৃত্যু সম্পাদিত হয়। এই মৃত্যু অবশ্যই পরিকল্পিত এবং ব্যক্তিটি জানে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

আবার Maris-এর অভিমত অনুসারে, যখন কোন ব্যক্তি তার মৃত্যু হতে পারে জেনেও এমন কোন জীবনধারাকে নির্বাচন করে যা তার মৃত্যু ঘটায়, তখন সেই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলা হয়।

আত্মহত্যার কারণ: আত্মহত্যা নতুন কোন বিষয় নয়। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমাজের উদ্ভব হয়নি যেখানে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়নি। আত্মহত্যা করার প্রবণতা সকল সমাজে ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে আত্মহত্যার ঘটনাটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা বিভিন্ন কারণে করে থাকেন, যেমন- ব্যক্তির উদাসীন অবস্থা, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, চাকরি হারানোর ভয়ে, প্রেমে ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, পিতা-মাতার অবহেলা, আত্মগ্লানি, দারিদ্র্যের জ্বালায় ইত্যাদি কারণে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু এই কারণগুলি ছাড়াও সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। যেমন-কেউ হয়তো তার প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কোন ছবি তুলেছে, সেই ছবিটিকে ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা বিশ্বে। আবার হয়তো গোপন ভিডিও রেকর্ড করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। এই অবস্থায় ভুক্তভোগী ব্যক্তিটি অভিমান ও লোকলজ্জা ভয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এই রকম বহু ঘটনা আমাদের বর্তমান বিশ্বে ঘটে চলছে

আত্মহত্যা ও স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য: আত্মহত্যা ও স্বস্তিমৃত্যুর দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলেও এবং উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যু স্বেচ্ছা নির্বাচিত হলেও আত্মহত্যা ও স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। তা হল মৃত্যু কামনার কারণগত দিক থেকে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি নিজেই তার মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু সেই ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করে জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, তার কাছে বর্তমান জীবন দুর্বিষহ, দুর্বিষক হয়ে উঠেছে। এরূপ জীবনকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় রূপে আত্মহননের পথ বেছে নেন সেই ব্যক্তি। পক্ষান্তরে,স্বস্তিমৃত্যু কামনাকরী ব্যক্তি তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য শান্ত সহজ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এই ব্যক্তির মরণ যন্ত্রণা যদি চরম তীব্র না হতো তাহলে সে স্বস্তিমৃত্যুর পথ নির্বাচন করতো না। ব্যক্তির নিকট মৃত্যুই তার শত্রু,জীবন নয়। ব্যক্তিটি এইভাবে মরতে চায় না,তাই সে অন্যভাবে মরতে চায়। সোমনাথ চক্রবর্তীর মতে, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজের মৃত্যুর তোড়জোড় করে, কারণ সে তার জীবদ্দশা থেকে রেহাই পেতে চায়; কিন্তু ইউথ্যানেসিয়ার ক্ষেত্রে একজন মানুষ স্ব-নিধনের উদ্যোগ নেয়, কারণ সে বিশেষ এক ধরনের অবাঞ্ছিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়1।

আত্মহত্যা ও স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে অপর একটি পার্থক্য হল আত্মহত্যার জন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই তার মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। অন্যদিকে স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির অর্থাৎ চিকিৎসক,স্বাস্থ্যকর্মী বা পরিবারের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

আত্মহত্যা ও হত্যার মধ্যে পার্থক্য: আত্মহত্যা ও হত্যার মাধ্যমে ব্যক্তির বর্তমান জীবনের সমাপ্তি হলেও এই দুটি কখনোই সমপর্যায় ভুক্ত নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আত্মহত্যা হলো নিজেকে হত্যা করা। কিন্তু 'হত্যা' শব্দটির অর্থ হল অপর ব্যক্তিকে হত্যা করা। আত্মহত্যার পিছনে কোন প্রকার প্রতিশোধের স্পৃহা নেই, ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের প্রসঙ্গ নেই,এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা নির্বাচিত। পক্ষান্তরে,হত্যার ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে। শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়, হিংসাবশত একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জীবনকে ধ্বংস করা হয়।

মানব সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই আত্মহত্যার ঘটনা গতিশীল। এই আত্মহত্যা নামক ঘটনা নীতিসম্মত কিনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পিথাগোরাস এবং তার অনুগামীরা আত্মহত্যাকে অনুমোদন করেননি। কারণ তাঁদের মতে, ঈশ্বর মানুষের পাপের জন্যই তার আত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করেছেন। সুতরাং এই জগতে প্রত্যেকটি মানুষের জন্ম তার কৃতকর্মের ফল। মানুষের জন্মকে ঈশ্বরের বিধান বলা যায়। আত্মহত্যা অপরাধ, কারণ আত্মহত্যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে। আত্মহত্যা ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদই বর্জনীয়। তাই আত্মহত্যা অন্যায়। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের আত্মাকে দেহ থেকে মুক্তি দানের অধিকারী2।

সক্রেটিসের দৃষ্টিতে মানুষ যেহেতু ঈশ্বরের সম্পদ সেহেতু তার আত্মহত্যা করা অনৈতিক। তিনি মনে করেন, মানুষ আত্মহত্যা করলে ঈশ্বর তাতে অসন্তুষ্ট হন এবং তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন। আত্মহত্যায় মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তে পলায়নী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। সক্রেটিস হেমলক্ বিষপান করেছিলেন এটি ভেবে যে, এটি ঈশ্বর প্রদত্ত বিধান যা অমান্য করা উচিত নয়।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Phaedo' ও 'Laws' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে কিন্তু সেই দুঃখ-দুর্দশা থেকে পালিয়ে আত্মহত্যাকে বেছে নেওয়া কখনোই কাম্য নয়। কারণ মানুষ যদি আত্মহত্যা করে সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়। তাঁর মতে, ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, আত্মহত্যা কাপুরুষোচিত এবং রাষ্ট্রের এক ধরনের অপরাধ। অ্যারিস্টটল নিকেমেকিয়ান এথিক্স গ্রন্থের নবম পুস্তকে আত্মহত্যার বিরোধিতা করেন এবং বলেন কোন ব্যক্তি যখন পরবত পরিমাণ অপরাধ করে অনুশোচনা করে এবং আত্মগ্লানী অনুভব করে তখন নিজের জীবনের গ্লানী থেকে মুক্তির জন্য নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটনোর উপায় হিসেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তিনি একই গ্রন্থের পঞ্চম পুস্তকে ন্যায়পরতার আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মহত্যাকে অন্যায্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারন তাঁর মতে, আত্মহত্যা নিজের দেহের ক্ষতিসাধন কল্পে করা হয়, কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তির জন্য নয়। তাই এটি দেশে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কাজ। এর পরিণতি নিজের উপর নয়,বরং রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়3।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় আত্মহত্যা সম্পর্কে যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। খ্রিষ্টধর্মে আত্মহত্যাকে নিন্দনীয় ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিনের বিচারে, আত্মহত্যা অন্যায় ও অপরাধ কর্ম। তাঁর মতে, কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে তার অনুশোচনার সুযোগ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। মানব জীবনে দুঃখ,কল্যাণ,অভাব অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ সে নিজে হস্তে ধ্বংস সাধন করে।

টমাস অ্যাকুইনাসের মতানুসারে, আত্মহত্যা একটি অন্যায় ও অনৈতিক কর্ম। অ্যাকুইনাস প্রধানত তিনটি কারণ দেখি আত্মহত্যার অনৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কারণগুলি হলো যথা- ১) আত্মহত্যা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ, ২) আত্মহত্যা সমাজ বিরুদ্ধ কাজ এবং ৩) আত্মহত্যা ঈশ্বরেচ্ছা বিরুদ্ধ কাজ। আত্মহত্যা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ এই জন্যে যে,মানুষ স্বভাবত আত্মপ্রেমী। আত্মহত্যা সমাজ বিরুদ্ধ কাজ এই কারণে যে, আত্মঘাতী মানুষ তার আত্মবিলোপের মধ্য দিয়ে সমাজের স্থিতাবস্থার হানি ঘটায়। আত্মহত্যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ,কারণ মানুষের জীবন-মৃত্যু

ঈশ্বরের হাতে, আত্মঘাতী সেই ঐশ্বরিক বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায়, ঈশ্বরের রাজত্বে অনুপ্রবেশ করে নিজের মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে4।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক আত্মহত্যাকে অন্যায় কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি মানুষের যদিও স্বাধীনতা আছে এবং তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশের অধিকারও আছে। কিন্তু আত্মহত্যা করার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন যে, মানুষ ঈশ্বরের সম্পদ। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের ইহলোকে আগমন ঘটেছে তার নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করার জন্য। প্রতিটি মানুষের উচিত নিজ জীবনকে রক্ষা করা এবং ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে মৃত্যুকে বরণ করা। আত্মহত্যা করার অর্থ হলো ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা, যা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে অসম্মান করা হয়।

জার্মান দার্শনিক কান্ট আত্মহত্যা সম্পর্কে লকের ন্যায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, আত্মহত্যা অনৈতিক ও অন্যায়। কান্ট মনে করেন যে, আত্মহত্যা মানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করা। তাঁর মতে, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের উপর কর্তব্যভার ন্যস্ত করেছেন,কেউ যদি সেই কর্তব্যভার থেকে এড়িয়ে আত্মহত্যা করে তবে তা অনৈতিক কর্মরূপে গণ্য হবে। ঈশ্বর চান যেন এই পৃথিবীতে প্রাণ সংরক্ষিত হয়, এই প্রাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মানুষের। আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে হওয়া উচিত। সুতরাং ঈশ্বর অভিপ্রায়কে সম্মান জানানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞা অনুসারে, প্রতিটি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে সব সময় নিজেকেই লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, লক্ষ্য সিদ্ধির উপায়ে রূপে নয়। কিন্তু আত্মহননকারী ব্যক্তি আত্মহত্যাকে উপায় রূপে ব্যবহার করে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা উপায় এবং দুঃখ মুক্তি হলো তার লক্ষ্য। কান্টের মতে, দুঃখ মুক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বলে গ্রহণ করে আত্মহনন অনুচিতকর্ম। জীবনকে কোন প্রাপ্তির উপায়রুপে গ্রহণ করে কেবল স্বতোমূল্যবান লক্ষ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করে বেঁচে থাকাই প্রত্যেক মানুষের উচিত কাজ।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এমাইল দূর্খাইম (Emile Durkheim) তাঁর 'The Suicide' গ্রন্থে বলেছেন যে, আত্মহত্যার মাধ্যমে সেই সব মৃত্যুকে উল্লেখ করতে পারি যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ক্রিয়ার ফলে সংগঠিত হয় এবং সে তার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব থেকে জ্ঞাত থাকে। দূরখেইম আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এরা উভয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা ও উদাসীনতা উভয়ই মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহী করে তোলে। সমাজের ওপর অধিক সম্পৃক্ততা ও নির্ভরশীলতা দুর্বল চিত্ত মানুষকে স্বাভাবিকভাবে কর্মসম্পাদনে বাধা দেয়। ফলে ব্যক্তি কাজ করতে ব্যর্থ হলে ক্ষোভ, দুঃখ অনুশোচনা ও হতাশায় সমাজের ওপর থেকে আস্থা হারায় ও আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং দূরখাইমের মতে,ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সুসম্পর্কের অভাব ও কার্যাবলী আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কম বেশি দায়ী।

সমাজতত্ত্ববিদ দূর্খাইম তাঁর 'The Suicide' নামক গ্রন্থে সমাজের অবকাঠামো ও কার্যাবলীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে চার প্রকার আত্মহত্যার কথা বলেছেন-

১) পরার্থবাদী আত্মহত্যা (Altruistic suicide): Altruistic suicide is the sacrifice of one's life in order to save or benefit others, for the good of group, or to preseve the traditions and honor of a society. It is always intentional. Benevolent suicide refers to the self- sacrifice of one's own life for the sake of the greater good5. অর্থাৎ পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলতে বোঝায় এমন যেখানে অন্য ব্যক্তিদের বাঁচাতে বা উপকারের জন্য, গোষ্ঠীর ভালোর জন্য অথবা একটি সমাজের সংস্কৃতি ও সম্মান রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দেওয়া। আমাদের দেশের সহমরণ বা মৃত স্বামীর চিতাতে স্বেচ্ছায় স্ত্রীর আত্মাহুতি এবং জাপানের 'হারাকিরি' এগুলি হল পরার্থমূলক আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত।

২) অহংকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide): পরার্থবাদী আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিপরীত হল অহংকেন্দ্রিক আত্মহত্যা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি শুধু নিজের জীবনকে ধ্বংসের জন্য আত্মহত্যা করে, গোষ্ঠী,সমাজের জন্য নয়। কোন ব্যক্তি যখন সমাজ, গোষ্ঠী ইত্যাদির থেকে দূরে সরে যায়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, নিজেকে নিঃসঙ্গ অনুভব করে, তখন ব্যক্তি তার জীবনকে মূল্যহীন রূপে গণ্য করে। এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেই। যেমন- উচ্চ কর্মরত ব্যক্তি যদি হঠাৎ কর্মচ্যুত হন সেক্ষেত্রে তিনি আত্মহত্যার পথ নির্বাচন করেন।

৩) অধঃপতন জনিত আত্মহত্যা (Anomic Suicide): নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির আত্মগ্লানির জন্য অথবা অপযশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহনন হল অধঃপতন জনিত আত্মহত্যা। অপরকে বঞ্চনা করার জন্য, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য, জীবনে যখন অখ্যাতি ও অপযশ ছাড়া আর কোন সঞ্চয় থাকে না এবং শত চেষ্টাতেও যখন ওই অপযশ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন পথ থাকে না, তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কাছে ওই নীতিভ্রষ্ট মানুষটি হয় নিত্যান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যক্তির সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না6।

৪) অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide): সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সবকিছুতে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। তারা মনে করে যে, তাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে সেগুলিকে অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। এরূপ অবস্থায় তারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাদের হতাশা গ্রাস করে। এ প্রকার মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নৈরাশ্যময় জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজেকে ধ্বংস করে। এরূপ আত্মহত্যাকে দূর্খাইম আদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা বলেছেন।

মন:সমীক্ষাবিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড আত্মহত্যাকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। ফ্রয়েডের মতে,ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা সামাজিক জটিলতা কারণে কেবল আত্মহত্যা হয় না,এর জন্য মানুষের নিজস্ব মানসিক আচরণ দায়ী। তাঁর মতে, মানুষের বিভিন্ন জৈবিক চাহিদা গুলির মধ্যে একটি হল প্রতিপক্ষকে হত্যার প্রবণতা। আত্মহত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তার জীবনকে ধ্বংস করে। আত্মহত্যাকারী নিজের জীবনে ধ্বংসের দ্বারা অন্যের প্রতিনিধিত্বকে নষ্ট করতে চায়। তিনি মনে করেন যে, আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী নয়। আত্মহত্যার কারণরূপে তিনি একজন ব্যক্তির শৈশবের দুঃখ-কষ্ট ও অতিরিক্ত চাপকে দায়ী বলে মনে করেন।

ফ্রয়েড আত্মহত্যার আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের দুটি প্রেষণার কথা উল্লেখ করেছেন-একটি হচ্ছে ইরোজ বা বাঁচার প্রবৃত্তি এবং অপরটি হচ্ছে থানাটোস,যা মৃত্যুর প্রবৃত্তি। তাঁর মতে,মানুষের মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তি সর্বদা সমভাবে রয়েছে। কিন্তু থানাটোস বা মৃত্যুর প্রবৃত্তি যখন ইরোজ বা বাঁচার প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, অবদমন করে তখন মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আত্মহত্যা যে ধরনেরই হোক না কেন তার মাধ্যমে একটি সুস্থ জীবনের অকালে পরিসমাপ্তি ঘটে। আত্মহত্যা তাই ব্যক্তির

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলিকে অকালে নিধন করে। সেই কারণেই সাধারণভাবে সামাজিক,ধর্মীয়,নৈতিক প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে নিন্দনীয় রূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও অনেকেই আত্মহত্যাকে সমর্থন জানিয়েছেন। ব্যক্তির যেখানে তার পরিবার তথা সমাজকে কিছু দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না,ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে সমাজ যেখানে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না,এরূপ ক্ষেত্রে অনেকেই আত্মহত্যাকে সমর্থন করেন। যেমন- দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে দুর্বিষহ জীবনকে বহন করে চলেছে, স্ত্রী-পুত্র কন্যার ভার বহন করতে অসমর্থ্য,কর্তব্য ক্লান্ত নিকট পরিজন যার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক এমন পরিস্থিতিতে ঐ অসহ্য রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা ছাড়া আর অন্য কোন পথ ঐ ব্যক্তির সামনে উন্মুক্ত থাকে না। এরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে বলা যায় যে,'প্রত্যেক ব্যক্তির বাঁচার যেমন অধিকার আছে তেমনি মরার অধিকারও আছে'।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম উক্ত বিশেষ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যাকে সমর্থন করেছেন। হিউম তাঁর 'Of Suicide'নামক প্রবন্ধে বলেছেন-"What is the meaning of that principle, that a man who, tired of life, and hunted by pain and misery, bravely overcomes all the natural terrors of death and makes his escape from this cruel scene; that such a man... has incurred the indignation of his creator by encroaching on the office of divine Providence, and disturbing the order of the universe"7? অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের নিয়ম অমান্য করা অনুচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জীবনে একান্তভাবে ক্লান্ত ও বীতশ্রদ্ধ, দুঃখ-কষ্ট, রোগশোকে জর্জরিত, সেই ব্যক্তি যদি সাহসপূর্বক স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে ভীত না হয়ে ঐ দুর্বিসহ নিষ্ঠুর জীবন থেকে পালিয়ে যায় অর্থাৎ আত্মহত্যা করে, তবে সেই ব্যক্তি কি প্রাকৃতিক বিধান অমান্য করে জগত সৃষ্টিকর্তার রোষের উদ্রেক করবে? হিউমের মতে, মানুষের জীবন আসলে পদ্ম পাতার জলের মতো, এই মুহূর্তে আছে, আবার পরমুহূর্তে নেই। মানুষের জীবন একটি ঝিনুকের চেয়েও মূল্যহীন। তাই কোন মানুষ যদি স্বেচ্ছায় নিজের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য এই জগত থেকে বিদায় নিতে চায় এবং তার ফলে যদি সমাজের তেমন কোন ক্ষতি না হয় সেক্ষেত্রে এটি অন্যায় বলে বিবেচিত নয়। আর এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে, এতে ঈশ্বর বিধান লঙ্ঘিত হবে।

আত্মহত্যার সমর্থনে অপর একটি যুক্তিতে হিউম বলেছেন যে, ঈশ্বরবাদীদের ধর্মীয় যুক্তিটিকে স্বীকার করেও আত্মহত্যাকে অন্যায় বলা চলে না। তাঁর মতে, যদি জাগতিক ও মানসিক জগতে সর্বত্রই ঈশ্বরের অমোঘ বিধান পরিলক্ষিত হয় এবং বস্তু জগত ও মানুষের মনোজগৎ উভয়ই ঈশ্বরের বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়,তবে মরার চেষ্টা যেমন নৈতিক অপরাধ রূপে গণ্য হবে তেমনি বাঁচার চেষ্টাকেও নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী। এ প্রসঙ্গে হিউম বলেন-"If I turn aside a stone which is falling upon my head, I disturb the course of nature, and I invade the peculiar province of the Almighty by lengthening out my life beyond the period which by the general laws of matter and notion he has assigned it"8. অর্থাৎ উঁচু পাহাড় থেকে যে পাথরের টুকরোটা আমার মাথায় এসে পড়ছিল, আমি যদি সেই মুহূর্তে আমার মাথাটিকে সরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করি, তবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হলো। কেননা মাথাটা সরিয়ে নিয়ে আমি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করছি এবং এর দ্বারা ঈশ্বর নির্ধারিত জড় ও গতির সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করছি। ঈশ্বরের যদি আমার মাথায় পাথর ফেলে আমার মৃত্যু ঘটানোর ইচ্ছা ছিল তবে আমি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে অন্যায় কাজ করেছি। কিন্তু আমার আত্মরক্ষাকে অপরাধ বলে মনে করি না। হিউমের মতে, ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যাও অপরাধ নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনায় নীলনদের যে প্রবাহিনীখাত, মানুষ যদি মরু অঞ্চলকে শস্য-শ্যামলা করার উদ্দেশ্যে নীলনদের গতিপথকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন পথে চালিত করে তবে তাকে যদি অন্যায় কর্ম বলা বলা না যায়, তাহলে যে ব্যক্তিটি দুঃখ কষ্টে জর্জরিত, যে সংসারের বোঝা আর বইতে পারছে না, পরিবার আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার মত যার কোন সামর্থ্য নেই, সেই ব্যক্তি যদি বুকে ছুরি বিদ্ধ করে রক্ত ধমনীর রক্তকে অন্য পথে চালিত করলে অর্থাৎ আত্মহত্যা করলে তাকেও নৈতিক অপরাধ বলা অনুচিত। সুতরাং হিউমের মতে, সাধারণভাবে আত্মহত্যা অনৈতিক হলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা সমর্থনযোগ্য।

সিদ্ধান্ত: সুন্দর এই ভূবনে প্রতিটি মানুষের উচিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে বেঁচে থাকা। বিশ্বসংসারে কোন মানুষের আত্মহত্যা করা উচিত নয়, তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনের অযোগ্য। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কাম্য। জীবনে চলার পথে দুঃখ, কষ্ট থাকবে, থাকবে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশ। এগুলোকে জয় করতে পারাটাই বিবেক বুদ্ধির সম্পন্ন মানুষের কর্তব্যকর্ম। এইসব প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া অন্যায় ও অনৈতিক। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আত্মহত্যাকে অনুমোদন দেওয়া যায়, তাহলে সমাজে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সামান্য কারণে মানুষ তার বিচার বিবেচনার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে টিকে থাকার মানসিকতা হারিয়ে ফেলবে। দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য-হতাশা, জ্বালা-যন্ত্রণা,ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা এগুলি জীবনে আসবেই। এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি যখন সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন বিচলিত না হয়ে,ভাবাবেগ দ্বারা তারিত না হয়ে বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেগুলিকে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব সেহেতু মানুষ আত্মহত্যা করলে তার পরিবার ও সমাজের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। মানুষ কেবল নিজের জন্য বাঁচে না, পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তার একটা বড় কর্তব্য আছে। সমাজে একজন ব্যক্তির সাথে আরও বিভিন্ন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। তাই কেউ আত্মহত্যা করলে তার পরিবার সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য মানুষজনও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় এবং সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। তাই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে সমর্থন করা যায় না।

আবার, সাধারণত আমরা দেখি যে, কোন ব্যক্তিই স্বাভাবিক অবস্থায় আত্মহত্যা করে না, যখন ব্যক্তির জীবনে ব্যর্থতা, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, অপমান ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আগমন ঘটে তখন সে এরূপ প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে কখনো সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষে বিশ্বাসী। কর্মবাদ অনুসারে, প্রত্যেক কর্মই একটি ফল প্রদান করে এবং প্রত্যেক কর্মই অপর একটি কর্মকে জন্ম দেয়। কর্মফল ভালো যেমন হয় তেমনি মন্দও হয়, কর্মকর্তাকে তার কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই ফল ভোগ করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত তার সমস্ত কর্মফল ভোগ না হয় ততদিন তার মুক্তি সম্ভব হয় না। কর্মবাদ অনুসারে, আমাদের বর্তমান অবস্থা অতীত কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বর্তমানের কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ধারিত হয়।তাই মানুষ যখন দুঃখ-কষ্ট,ব্যথা-বেদনা, জ্বালা - যন্ত্রণা, ব্যর্থতা,হতাশা ইত্যাদি ভোগ করে তখন তার এরূপ

বর্তমান অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। কারণ তার বর্তমান অবস্থা পূর্বকৃতকর্মের ফল। এরূপ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন যোগ্য নয়, কারণ সে তার পূর্বকৃত কর্মফল ভোগ না করেই আত্মহত্যা করে ফেলছে। ব্যক্তির এই আত্মহত্যারূপ মন্দ কর্মের ফল এবং যে কর্মফল সে ভোগ থেকে বিরত থাকলো সেই কর্মফল ভোগ করার জন্য ব্যক্তির আবার পুনর্জন্ম হবে। ফলে ব্যক্তিটি পূর্ব জন্মের চেয়ে বর্তমান জন্মে আরও বেশি দুঃখ- কষ্ট,জ্বালা-যন্ত্রণা,ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি ভোগ করবে। ব্যক্তিটি যদি আবার পরজন্মে ওই রূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে তবে তার অবস্থা আরো বেশি শোচনীয় হয়ে পড়বে। আর এভাবে চলতে থাকলে ব্যক্তিটি কোন জন্মেই কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেই থাকবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, আত্মহত্যার বিষয়টি কর্মবাদকে নস্যাৎ করে দেয় বলে আবার, সমাজের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে বলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে কোন ভাবে সমর্থন করা যায় না। ব্যক্তির বর্তমান পরিস্থিতি যত খারাপই হোক না কেন, সেখান থেকে পলায়ন না করে ব্যক্তিকে পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করে জীবন যুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রেখে পূর্বকৃত নিজ কর্মফল বর্তমানে ভোগ করে, ভালো কর্ম সম্পাদন করে এবং আত্মহত্যারূপ পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মুক্তির পথ উন্মুক্ত রাখায় শ্রেয়।

তথ্যসূত্র:

1. কথায় কর্মে এথিকস, সোমনাথ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-১৬৭।
2. নীতিশাস্ত্র, দীক্ষিত গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২০৮।
3. প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা, এ, এস, এম, আবদুল খালেক, পৃষ্ঠা-২১৪।
4. কথায় কর্মে এথিকস, সোমনাথ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-১৭২।
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Altruistic Suicide.
6. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-১৫২।
7. 'of Suicide', David Hume, in Applied Ethics, Ed by Peter Singer, page-22.
8. Ibid, page-23.

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

1. চক্রবর্তী, সোমনাথ, কথায় কর্মে এথিকস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০১১।
2. পাল, ডঃ সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতিশাস্ত্র, (প্রথম খন্ড) লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১।
3. গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৭।
4. খালেক, আবদুল, প্রায়োগীক নীতিবিদ্যা, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ-২০০৯।
5. সামন্ত, ডঃ বিমলেন্দু, নীতিতত্ত্ব, স্মার্ট বুকস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০২১।
6. Singer, Peter, Applied Ethics, Oxford University press, 1986.
7. Singer Peter. (ed) Ethics, Oxford University press, 1994.
8. Durkheim, Emile, suicide-A study in sociology; Routledge, London and Now York, 1952.
9. Hume David. The Treatise of Human Nature, Claredon press, Oxford, 2007, 1.
10. Jatava DR. A Philosophy of suicide, ABD publishers, Jaipur, India, 2010.
11. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯।
12. সরকার, স্বপ্না, নীতিবিদ্যা: ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা, মিত্রম, কলকাতা, ২০২২।
13. ধর, বেনুলাল, ব্যবহারিক নীতিদর্শন, মিত্রম, কলকাতা, ২০১৭।
14. সিঙ্গার, পিটার, রায়, ডঃ প্রদীপ (অনুবাদ), ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ-২০২৩।